The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 14, No. 27-28, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

ভাষা ও সংস্কৃতি অন্বেষণে মুহম্মদ আবদুল হাই

ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

Abstract: Muhammad Abdul Hye is one of the most influencial linguists in Bangladesh. He was popular Bengali author for his scholary contribution of Bangla literature and language. He was educationist, researcher, litterateur, editor, phonologist, novelist and professor. He was born in Murshidabad, India in 1919 in the village of Maricha. He was died in a train accident on 3 June 1969. Abdul hye contributed much in the discussion of language and culture. He wrote some books and article in this field. Among them Vashar kotha, Kotha Shekha, Dhonir bebohar, Shuvashon, Toshamoder vasha, Rajnitir Vasha, language and literature etc are mentionable. Man expresses his views, information, tradition, ritual all things with the help of culture. Language is itself a part of culture. Language plays a vital role to express culture. So sometimes it is called the vehicle of culture. There is a relationship between language and culture. Muhammad Abdul Hye had discussed and analyzed with examples about this. To express culture follow the rules and regulation of a particular society or context. it is not enough to know the rules or grammar of a language, it is also inevitably needed knowing the norms, values, traditions, and many things to use the language. That means cultural knowledge is very important to use the language. Muhammad Abdul Hye has given importance these factors in the discussion of language and culture. This article has been attempted to enumerate the analysis about language and culture of Mohammad Abdul Hye view.

চাবি শব্দ: ভাষা, সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব, তোষামোদ, সাহিত্য, রাজনীতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিভূ হলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি এদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নতুন দিকের সূচনা করেন। তাঁর আগে এদেশে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক-এই দুই উপায়ে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা হয়েছে। তিনিই প্রথম ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রসার ও প্রচার করেন। বিশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্ণনামূলক

* অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষাবিজ্ঞানের চারটি প্রধান বিভাগ হলো ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ধ্বনিবিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন। ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্ক আলোচনায় তিনি এ বিষয়ে নানা দিক তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং রচনা করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। এসব উৎস থেকে ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ভাষা ও সংস্কৃতি সংবলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

সংজ্ঞাপনে সংস্কৃতির অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। সাংস্কৃতিক জ্ঞান না থাকলে সংজ্ঞাপন যথার্থ হয় না। সংস্কৃতিভেদে সংজ্ঞাপনের ধরনও পৃথক হয়। এই সাংস্কৃতিক জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভাষারও একটি কাঠামো থাকে। বিষয়টি উপলব্ধির জন্য ভাষিক জ্ঞানের সারতা তাই সহজেই অনুমান করা যায়। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ভাষা ও সংস্কৃতির নানাবিধ প্রপঞ্চ নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের এসব রচনা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতি-এ দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তেমন আলোচনা পাওয়া যায় না। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মুহম্মদ আবুদল হাইয়ের অভীক্ষা পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই এ গবেষণাকর্মের যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি বর্ণনামূলক গবেষণা। তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে।

৪.১ *উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল:* গবেষণাকর্মটিতে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ বিষয়ে প্রকাশিত বই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বেছে নেয়া হয়েছে।

৪.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ: উপাত্ত সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে গুণগত পদ্ধতি ও মিশ্র পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

৫. গবেষণা প্রশ্ন

গবেষণাকর্মে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে;

ক) ভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অভিমত কী?
খ) সংস্কৃতি সম্পর্কিত মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অন্বেষা কী?

৬. ভাষাবিজ্ঞানী আবদুল হাইয়ের পরিচিতি

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। তারপর ভর্তি হন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কৃতিত্বের সঙ্গে এইচএসসি পাশ করে তিনি ১৯৩৮ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। 'তিনি ১৯৪১ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৪২ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই প্রথম মুসলিম ছাত্র যিনি বাংলা অনার্স ও এম.এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার গৌরব লাভ করেন' (মনিরুজ্জামান, ২০০০: ১৫)।

মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। তিনি ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ভাষাতত্ত্বে গবেষণার জন্য ভর্তি হন। এখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন বিশিষ্ট ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী জে, আর ফার্থ। তাঁর অধীনে তিনি *A Study of Nasals and Nasalization in Bengali* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঐ বছরই দেশে ফিরে এসে বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি এ বিভাগে রীডার ও অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন । এরপর ১৯৬২ সালে তিনি বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন (হোসেন, ২০১৮)।

বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা কালে এ বিভাগের উন্নয়নের জন্য তিনি গুরুত্বর্পূ ভূমিকা পালন করেছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের গবেষণা বৃদ্ধি, দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাকার্যক্রমকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা সত্যিই যুগান্তকারী। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় তিনি যে সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য তৈরি করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশে বিদেশে আজও ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় তাঁর প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান অধ্যয়নে তাঁর অবদান অনন্য। বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথপদর্শক প্রতিভূ তিনি। বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর অবদান সম্পর্কে হক বলেছেন, 'আধুনিক

ভাষাবিজ্ঞান ও আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান একটি নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যা। বাংলা ভাষার নিকট এ বিদ্যা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। এই বিলেতি বিদ্যায় পারদর্শী লোকের অভাব আমাদের নেই। কিন্তু আজ অবধি অধ্যাপক আবদুল হাই ছাড়া আর কেউ এ বিদ্যা বাংলা ভাষায় আমদানী করেননি (হক, ২০০০: ৭৬)।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বছরের হিসেবে তাঁর জীবন দীর্ঘ দিনের নয়। তিনি এই জ্ঞানতাপস ১৯৬৯ সালে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৭. ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় মুহম্মদ আবদুল হাই

মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ভাষা ও সংস্কৃতি অন্বেষণে তাঁর আলোচনার সারথি হয়েছে ভাষার কথা, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব, তোষামোদের ভাষা, রাজনীতির ভাষা, ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসি শব্দ: ভূমিকা, আমাদের অনুবাদ-সাহিত্য, ঢাকাই উপভাষা, বৃষ্টির প্রবাদ, ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

৭.১ *ভাষার কথা: ভাষার কথা* প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষার নানাবিধ অনুষঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি ভাষার সংজ্ঞা, ভাষার ইতিহাস, ভাষার গুরুত্ব, ভাষাবিজ্ঞানের বর্তমান গতি-প্রকৃতি, ভাষা উৎপাদনে ধ্বনির আবশ্যকতা, ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি দিক তুলে ধরেছেন।

> মানুষের জীবনে ভাষার অপরিসীম গুরুত্বকে তিনি পুনরাশ্রিত করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, মানুষের জীবনে ভাষার স্থান যে কত বড়ো তা আমরা খুব কমই ভেবে থাকি। আমরা যেমন খাই দাই, ওঠা-বসা করি ও হেঁটে বেড়াই, তেমনি সমাজ জীবন চালু রাখবার জন্যে কথা বলি, নানা বিষয়ে, নানা ভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা (হাই, ১৯৯৪: ২৮১)।

'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা পরিচয় গ্রন্থের সূচনাতেই বলেছেন, 'ভাষা না হলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম হতে বঞ্চিত হত' (উদ্ধৃত, মুসা, ১৯৯৫:১৯৯)।

'মানব-বিকাশের ইতিহাসে ভাষা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এটা নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী উভয়েই নানাভাবে স্বীকার করেছেন। ভাষা মানুষের আত্মস্থ হাতিয়ার হিসেবে তাকে তার অসম্পূর্ণতার ইতিহাস রচনা করার সুযোগ দিয়েছে; ভাষা তাকে মনে করতে ও মনে রাখতে সহায়তা করেছে' (মুসা, ১৯৮৫: ৩৩-৩৪)। ভাষার এই অবদান কোনোক্রমেই এড়িয়ে চলা যায় না। প্রাত্যহিক দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সংজ্ঞাপনে মানুষের ভাষার যে অপরিসীম ভূমিকা তা বলাই বাহুল্য। ভাষার যে কী অমিত পারঙ্গমতা আজকের মানব সভ্যতার চরমোৎকর্ষ তার পরিচায়ক। 'মানুষ তো

জন্মায় অসম্পূর্ণ মানুষ হয়ে, জন্তু হয়ে। তারপর দিনে দিনে তার কেবলমাত্র প্রাণিত্বের সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে সে মানুষ হয়ে ওঠে' (ঠাকুর, ১৩৫৬: ১৩)। 'ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে এবং সমাজ-সৃষ্টি, সভ্যতার উদ্ভব-বিকাশ সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে মানুষের ভাষা-আবিষ্কার। ভাষা হচ্ছে মানুষের হাতিয়ার, তার ঐশ্বর্য (ইসলাম ,২০০০: প্রাক-কথন)।

যে কোনো ভাষার চারটি মৌলিক উপাদান থাকে-ধ্বনি বা ধ্বনিমূল, শব্দ বা রূপমূল, বাক্য ও অর্থ। ভাষাবিজ্ঞানের মৌলিক চারটি উপাদান ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব-এই চারটি অংশ নিয়েই গঠিত হয়েছে। অধ্যাপক আবদুল হাই ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম উপাদান ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে বিস্তর কাজ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভাষা বিশ্লেষণ করতে হলে এই উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুসন্ধিৎসা আরও ভাবনার বিস্তার ঘটায়। তিনি বলেছেন, 'কতগুলো অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে এক এক সমাজের মানুষ তাদের সামাজিক জীবন চালু রাখে। এক এক সমাজের সকল মানুষের অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা' (আজাদ, ১৯৯৪: ২৮১)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় এদেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সরকার (১৯৯৪) এর উক্তিতে এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়-

> পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রিচার্ড হ্যারিসের কাছে করা চার্লস ফার্গুসনের অব্যবহিতরূপে এদেশে কোনো নতুন গবেষণার আবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। তার সহজ কারণ, অপ্রকাশিত বই এই কাজটি উপমহাদেশের কোনো গবেষকের কাছে সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু মুহম্মদ আবদুল হাই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জে আর ফার্থের পদ্ধতি অনুসরণ করে বাঙলা নাসিক্যধ্বনি ও অনুনাসিকত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, তাই হয়তো সাংগঠনিক ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালী গবেষকদের প্রথম কাজ (পৃ.২৮)।

মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন যে মানুষের বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি এক একটি শব্দ তৈরি করে, এই শব্দ তৈরি করে বাক্য এবং পরিশেষে বাক্যই মানুষ সংজ্ঞাপনে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ধ্বনিই ভাষার প্রথম ক্ষুদ্রতম একক। ভাষার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'Language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a systems of voluntarily produced symbols' (হাই, ১৯৯৪: ৬১০).

কোনো ধ্বনির ব্যবহারে হেরফের হলে বদল হয়ে যায় তার ভাব ও অর্থ। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন নির্বাচিত ও নির্বাসিত শব্দযুগল। কোনো নেতার আগে যদি নির্বাসিত শব্দ প্রয়োগ করা হয় তবে তা চিন্তা ও আঁতকে ওঠার মতো সংবাদ হবে বৈকি। কিন্তু যদি নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করা হয় তা আনন্দের ও আশ্বস্তের একটা

সংবাদ হবে অধিকাংশ পাঠকের কাছে। নির্বাচিত ও নির্বাসিত-এ দুটো শব্দের সবকিছু ঠিক রেখে শুধু 'স' এর সঙ্গে 'চ' বদল করলে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের দুটো শব্দ পাওয়া যায়। 'চ' বসালে পরিববার-পরিজন থেকে শুরু করে অনেকের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বাহবা পাওয়া যায়। আর 'স' বসালে নিন্দা, ঘৃণা, অবজ্ঞার শেষ থাকে না। অনেকের মাথায় তাই আকাশও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। লিখিত 'চ' এবং 'স' এর মধ্যে এমন দুটি ধ্বনি জড়িত থাকার জন্যই এরূপ বিপত্তি ঘটে। কাজেই ভাষায় ধ্বনির গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভাষাবিজ্ঞানের যে চর্চা হচ্ছে তা প্রাচীন ভারতের চর্চারই বিস্তারিত রূপ মাত্র। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যাস্ক, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখ গুণিজনেরা ভাষা বিশ্লেষণের জন্য ধ্বনিবিজ্ঞানের যে চর্চা করেছেন বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানীরা তা-ই করেছেন। পার্থক্য হলো এই, পাণিনি ও অন্যান্যের ধ্বনি গবেষণার ভিত্তি ছিল অনুভূতি আর বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, ভাষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; আমাদের জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট। সব দিক থেকে রস সংগ্রহ করে ভাষা জীবন্ত বৃক্ষের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষের প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, আবার মানুষকেই তা জীবনীশক্তি দান করে (শ', ২০১২)। বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষার সর্বস্তরে সরকারী কাজকর্মে বাংলাভাষার প্রচলন হয়, এখন থেকেই তার যথাবিহিত ব্যবস্থার সূচনা করা হবে (মনিরুজ্জামান, ২০০: ১৭)।

৭.২ *ভাষা ও মানব-জীবন:* ভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনকে সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

Language is conditioned by three key-factors. The first is to do with what is the language itself, the second with what's in the context of communication, while the third is to do with what's in your head (that is, the assumptions and knowledge you bring to a text) (Simpson, 1997: 3)।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধতার প্রধান অবলম্বন হলো ভাষা। কারণ, মানুষের সমাজবদ্ধতার মূলে রয়েছে ভাষা। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষ তার প্রয়োজন, চিন্তা, কর্ম, ভাব প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। ভাষা সমাজের দর্পণস্বরূপ হিসেবে বিবেচিত। ভাষার মধ্যে সমাজের রীতিনীতি, ভাব ও মানসিকতা প্রতিফলিত হয় (বিশ্বাস, ১৯৬৮)। মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা ও মানব-সমাজ প্রবন্ধে ভাষার সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৭.৩ *ভাষা ও ব্যক্তিত্ব: ভাষা ও ব্যক্তিত্ব* প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাহন ভাষার ভূমিকা, ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত, ব্যক্তিত্ব প্রকাশে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের সারতা অনুধাবন প্রভৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

ব্যক্তিত্ব মানুষের পরম সম্পদ। এর মাধ্যমে অন্যকে যেমন আকৃষ্ট করা যায় তেমনি নিজেকে প্রকাশ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এর জুড়ি নেই। দৈহিক গঠন কিংবা সম্পত্তি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের গৌণ মাপকাঠি হলেও এর মূল হলো আচার-ব্যবহার, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সহায়ক হলেও মানুষের মুখের ভাষাই ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম উপায়। কারণ প্রকাশ ব্যতিরেকে ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা যায় না। প্রকাশের রূপ ধরে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মুহম্মদ আবদুল হাই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''প্রকাশ ছাড়া ব্যক্তিত্ব নেই, প্রকাশের রূপ ধরে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আচার-ব্যবহার, চালচলন এবং রুচি মানুষের ব্যক্তিত্বের কিছুটা প্রকাশক বটে, কিন্তু সমাজ-জীবনে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রকাশক তার মুখের কথা। সামাজিকতার সবচেয়ে বড় উপাদান, এমনকি একমাত্র উপাদান পরস্পরের মধ্যে তার বিনিময় এবং এ ভাব বিনিময় মানুষ করতে পারে ভাষার মাধ্যমেই (আবদুল হাই, ১৯৯৪: ২১৫)।

মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই ব্যক্তিত্ব যে মানুষের এক জীবনেই বিরাজ করে তা নয়। দেখা যায়, পিতামাতার ব্যক্তিত্বের ধারা ভবিষ্যত প্রজন্মেও সংক্রামিত হয়, এমনকি এক এক বংশের সকল মানুষের মধ্যেই এ ধরনের ব্যক্তি চেতনায় এক একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখা যায়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব কোথায়-এমন প্রশ্ন বর্তমান আলোচনায় অবান্তর নয়। স্বকীয়তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল চাবিকাঠি। মানুষ ভাষার মাধ্যমে যতটা স্বকীয়তা বা স্টাইল প্রকাশ করতে পারে আর অন্য কিছুতেই তা সম্ভব নয়। ভাষা ব্যক্তিত্ব নয় আবার ব্যক্তিত্ব ভাষা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভাষা ছাড়া ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায় না। কাজেই ভাষা ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই বলা হয়ে থাকে ব্যক্তিত্ব যেমন পূর্বাপর একটি চেতনা তেমনি মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে সে ভাষাও তার ক্ষণিকের বা মুহূর্তবিশেষের একটা কথনভঙ্গি নয়। শৈশব কৈশোর থেকে তার পরিবেশ থেকে, তার শিক্ষাদীক্ষা, সংসর্গ-সাহচর্য ও রুচির মাধ্যমে তার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাকে কেন্দ্র করে তার স্মৃতি-দেশে যুগের পর যুগ ধরে সঞ্চিত হচ্ছে তার আহরিত ভাষা। তার পূর্বাপর চেতনাকে রূপায়িত করার জন্য, তার মুখের কথা দিয়ে তাকে স্বপ্রকাশিত করার জন্য তার মধ্যেই নির্মিত হচ্ছে ভাষা মহাসমুদ্রের অলক্ষ্য জগৎ। তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে তার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই আলাদিনের চেরাগের মতো তার আহরিত ভাষা তার কাজে লাগছে। সে জন্যই তার ব্যক্তিত্ব ও ভাষার এ সাযুজ্য বন্ধন।

মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো তার কথা। কথায় বলে, কথাই মানুষকে মানুষ করেছে। কথার মাধ্যমে মানুষকে যেমন আকৃষ্ট করা যায় তেমনি তাকে অধীনেও আনা যায়। অনেকের কথার যাদুর শক্তির কল্যাণে অনেক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তোলে। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার মাধ্যমে জীবনে অনেকেই জীবনের বাঁক ঘুরিয়েছেন। এখানে মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতে তার বাচনশৈলীকে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ যদি সুন্দর বাকশৈলীর অধিকার হয় তাহলে তার কথার মারপ্যাচ ও জাদুর জালে আবদ্ধ হতে পারে অনেকে। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথা বলা যায় তাঁর শারীরিক গঠন তেমন সুশ্রী ছিল না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধির দৃপ্তি, মনের জোর, বুকের বল, ভাষার প্রয়োগ প্রভৃতিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'তাঁর আপাত ক্ষীণ দেহ থেকে কথা বলার সময় যে ধ্বনি নির্গত হতো তা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এক একটা শাণিত তরবারি আর বন্ধুকের বুলেটের কাজ করতো। এ কারণেই সরোজিনী নাইডু বলেছেন, তিনি যেন খাপে-ঢাকা শাণিত তলোয়ার। কোষমুক্ত হলেই তার ব্যক্তিত্ব কথার মাধ্যমে আর বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে' (আবদুল হাই রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৪)।

৭.৪ *ভাষা ও সাহিত্য:* মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ হচ্ছে 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য'। সাহিত্য সংস্কৃতির একটি ধারা। সাহিত্যের প্রকাশ ভাষানির্ভর। সাহিত্যের ধরন অনুযায়ী ভাষাব্যবহারের ধরনেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণে তিনি ভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বোঝানোর জন্য মুহম্মদ আবদুল হাই ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ও রাজনীতি, সময়ের ব্যবধানে সাহিত্যের রূপ-রূপান্তর, প্রাত্যহিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্যের প্রভাব, পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশের মুসলমানদের সাহিত্যের ভাবনা তথা সাংস্কৃতিক রূপ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন।

সাহিত্য মানুষের জীবনের ছবিকে ফুটিয়ে তোলে। ভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং সাহিত্যের প্রকাশরূপ যে ভাষা, তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নামক শিল্পটি সম্ভব হতে পারে না (শ', ২০১২: ৭)। সাহিত্য একটি শিল্পকলা, আর ভাষা হচ্ছে তার প্রকাশ মাধ্যম। সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। হকেট এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Literature is an art-form, like painting, sculpture, music, drama, and the dance. Literature is distinguished from other art-forms by the medium in which it works: language (Hockett, 1968: 558).

সংস্কৃতি বিচার বিশ্লেষণে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথমটি আত্মপ্রকাশ করে জাতির দৈনন্দিন জীবনধারাকে অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস থেকে শুরু করে সামাজিক উৎসব পালন করা পর্যন্ত তার বিস্তার। সংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারা লক্ষ করা

যায়, উদ্দিষ্ট সমাজের ব্যক্তি চেতনার সমষ্টিগত রূপ ও তার চিত্তসত্তার বহিঃপ্রকাশকে। একই সময়ে ওই বিশেষ মানবগোষ্ঠীর চিন্তাজগতে জীবনের রহস্য কিভাবে উদঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে, এই চিন্তাধারা তার আত্মিক-সংস্কৃতি স্বরূপ প্রকাশ করার মাধ্যমে এরূপ অন্বেষা গুরুত্ব পায়। এখানে আসে তার কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক চেতনা ও জীবনবোধ মানব সমাজের বাস্তব ও অন্তজীবনের সমষ্টিগত রূপ (ইব্রাহিম, ১৯৯০:৪)।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে বাংলা মুসলমানদের ভাষা বাংলা হবে না উর্দু হবে কিংবা অন্য কোনো ভাষা হবে তা নিয়ে বিরোধ দেখা যায়। নিচের উক্তিতে তার প্রমাণ আছে-

> বাঙালী মুসলমানদের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত কিনা এবং হলে তার রূপ কি হবে? আরবি পারসি মেশানো, সংস্কৃত প্রভাবান্বিত না এ কালের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু বাংলা মেশানো খিঁচুড়ি ভাষা? আর তার সাহিত্যই বা কি হবে? ইসলামী? না পশ্চিমবাংলা ঘেঁষা? না, বাংলার মাটিতে বাঙালি-ইসলামী; না অন্য কিছু? এ নিয়ে পাকিস্তান হবার পর থেকেই তর্ক চলে আসছে। এ তর্ককে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকদের মধ্যে যেমন কাদা ছুড়াছুড়ি হয়েছে তেমনি পানিও কম ঘোলা হয়নি (হাই, ১৯৫৪: ১৩)।

পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার সমস্যা নিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, বাঙালিরা সে সময় বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করবে না উর্দু ভাষায় কিংবা অন্য কোনো মুসলমানী ভাষায় সাহিত্য রচনা করবেন তা নিয়ে তারা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে একদল চেয়েছিলেন বাংলা বর্জন করে উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে। অপরপক্ষ বাংলা ভাষাকে ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের লেখায়। এ ধরনের এক পরিবেশের মধ্যেই ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর *রসূল বিজয়* গ্রন্থের ভূমিকায় দুঃখ করে লিখেছেন–

কত দেশে কত ভাসে কোরানের কতা।
দিন মোহম্মদী বুজি দেয়ন্ত বেবস্তা।।
জন্মদোষে বঙ্গেতে বঙালী উৎপন।
না বুজে বাঙালী সবে আরবী বচন।।

বঙ্গদেশী সকলেরে কিরূপে বুজাইব।
বাঙালী আরব ভাষায় বুজাইতে নারিব।।
জারে যেই ভাসে প্রভু করিছে সৃজন।
সেই ভাস তাহার অমূল্য সেই ধন।।
(উল্লেখ, হাই, ১৯৫৪: ১৬)

ভাষার এই আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিটি বাঙালির মননে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরাধীন বাংলাদেশে যেসব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার ছত্রে ছত্রে বাংলা ভাষার স্বতস্ফূর্ত উচ্চারণে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে কোনো সাহিত্যিক মনের আবেগকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। এসব সাহিত্যে তৎকালীন সংস্কৃতির স্বরূপ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট। সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমের এরূপ ক্ষোভ ও দুঃখ আজও আমাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির শিকড় অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে-

যে সবে বঙ্গেতে জন্ম হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।।
মাতা-পিতামহ-ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশিভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না ফুড়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।।
(উল্লেখ, হাই, ১৯৫৪: ১৬)

বাংলা সংস্কৃতি প্রকাশে সাহিত্যের অবদানকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ অঞ্চলে তথা বাংলাদেশে যত আন্দোলন হয়েছে সেখানে ভাষার প্রশ্নটি অতি সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে। কবি সাহিত্যেকের লেখায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় আমাদের সংস্কৃতি। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন: 'সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্থরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে' (উদ্ধৃত, রহমান, ১৯৯৫: ২৭)।

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর শাসকশ্রেণির বিরূপ মনোভাবের কারণে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সঙ্কটের মধ্যে প্রোথিত হয়। আরবি হরফে বাংলা লেখন, আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের আর্থিক প্রয়োগ, বাংলা সাহিত্য থেকে হিন্দুয়ানি বিষয় বর্জন, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ, কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামা সঙ্গীত প্রচারে বাধা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। সংস্কৃতির এ দুর্দিনে মুহম্মদ আবদুল হাই পেশাগত দায়িত্ব ও নৈতিক বোধ নিয়ে এগিয়ে এলেন। ১৯৬২ সালে তিনি যখন বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গনে ছিল দুঃসময়। বাংলা সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য তিনি বিভাগে ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করেন সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি দ্রুত সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ আয়োজন একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয়া

পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এবং সব শ্রেণির মানুষের মনে বাংলা সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল (আহমদ, ২০১১: ২৯০)।

৭.৫ *তোষামোদের ভাষা*: *ভাষার কথা* প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ভাষার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এতে ভাষাতত্ত্বের বিষয়গুলি এত সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে পাঠক পড়া মাত্রই অনুধাবনে সচেষ্ট হবেন। হোসেন (২০০০) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভাষাতত্ত্ব তো ব্যাকরণ জাতীয় জিনিস; কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লেখক যেন বোবা তত্ত্বকেও কথা বলিয়ে ছেড়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, হাই সাহেব দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর অতি পরিচিত বিষয়গুলি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পেরেছেন' (পৃ.১৩৮)।

তোষামোদের *ভাষা* প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই তোষামোদের সঙ্গে সামাজিক প্রথা বা চর্চার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে রাজনীতি কীভাবে তোষামোদের বিষয়টিকে চালিত করে তার একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তোষামোদ শব্দটির কয়েকটি অর্থব্যঞ্জনা রয়েছে; যেমন কারো সম্পর্কে অত্যুক্তি করা, অধিক প্রশংসা করা, বন্দনা করা প্রভৃতি তোষামোদের নামান্তর। ভাষীদের কাছে এরূপ তোষামোদ করাকে বলা হয় তেল দেয়া। আর যিনি এ কাজটি করেন তাকে বলা হয় তেলবাজ। শব্দটি ইদানীং নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে নানা ধরনের মানুষ বাস করেন। তাদের সবার ব্যক্তিমানস ও যোগ্যতা এক নয়। নিজের দুর্বলতাকে ছাপিয়ে অন্যের সবলতাকে পাশ কাটিয়ে সমাজে উচ্চাসনে উত্তীর্ণ হওয়ার হীন মানসে অনেকে তোষামোদের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তখন তার কাছে নীতিবোধের চাইতে কাজ হাসিল করাই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কথার মারপ্যাচে ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছের মানুষ হয়ে যান ক্ষণিকের মধ্যেই। সমাজে চাহিদার তুলনায় সরবরাহের যোগান কম বলেই এমনটা হয়ে থাকে; কারণ কিছু মানুষ সব সময় বিশেষ সুবিধা নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। 'তখনই শুরু হয় কথার পালা, মনের কাছে মনকে ফুটিয়ে তোলার ভূমিকা। সুতরাং মনের কাছে মনের সম্পর্ক পাতানোর কথা ছেড়ে দিলেও নিছক ব্যবহারিক জীবনের আদান প্রদানের বেলাতেও মানুষের মনই সক্রিয় হয়ে ওঠে। কথার সাহায্যেই ব্যক্তিমানুষের তথা সমাজমনের সজীবতা রক্ষা পায় (হাই, ১৯৯৪: ৩০৩-৩০৪)।

তোষামোদ এক ধরনের কৌশল বা উপায়। এর মাধ্যমে মানুষের মন হরণ করা যায়, চিত্তকে জয় করা যায়। এ উপায়ের মাধ্যমে তোষামোদকারী ভাষার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার প্রয়াসী হয়। তোষামোদকারী হতে পারে প্রেমিক, রাজনীতিবিদ, চাকুরিপ্রার্থী ইত্যাদি। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। নিজেকে

উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করাই তোষামোদকারীর মূল উদ্দেশ্য। তোষামোদকারীর কবলে যিনি পড়েন তিনি মুহূর্তের জন্য হলেও হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অতি তুষে তুষ্ট হয়ে তিনি তোষামোদকারীকে সুযোগ করে দেন। যেমন কোনো খ্যাতনামা অফিসের বসের কাছে এসে যদি কেউ বলেন আপনি খুব ভালো লোক, আপনার সুনাম আমাদের দেশে সুবিদিত। আপনাকে চেনেন না এমন লোক কমই আছে আমাদের দেশে। তারপর একে একে তাঁর জয়গান গাইতে থাকেন। যখন দেখেন যে ঐ ব্যক্তি বশে এসেছে তখন তোষামোদকারী তার মনের আসল প্রস্তাবটি দেন। পূর্বে তার মুখের অমিয়বাণী গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে তার কাজটি করে দেন অথবা তার কাজ করার আশ্বাস দেন। এভাবে তোষামোদকারী ভিন্নজনের কাছে সুবিধা পেয়ে থাকেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই তোষামোদের দুটি দিক উল্লেখ করেছেন—একের পক্ষে যা তোষামোদ অন্যের পক্ষে তা প্রশংসা। তা একদিক থেকে তোষামোদকারীর কথায় কলাকৌশল প্রকাশ করে আর অন্যদিকে অনেক সময় তার অন্তরের দৈন্য ও রিক্ততাও ফুটিয়ে তোলে।

তোষামোদ প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে। ভাষা এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই তোষামোদের প্রচলন হয়ে আসছে বিধায় কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখায় এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসের একটি দৃশ্যের নায়ক ও নায়িকার মধ্যে এরকমের কতগুলো কথা তোষামোদের ভাষারই নামান্তর—

'স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জহর বলিল, যাক, এত সহজে তোমাকে বোঝা যাবে, আশা করিনি, সুখলতা'।

- এই – সামান্য কথাটা বুঝতে তোমার এত দেরি হলো?
- সামান্যর পর এত আবরণ যে, বেচারা দুঃশাসন একেবারে হয়রান! তুমি এখন তবে কি করবে? চাকুরি?
- হ্যাঁ, চাকুরি একটা খুঁজবো।

জহর কহিল, তোমরা কিন্তু চাকরী খুঁজতে নামলে আমাদের সমূহ বিপদ। একেই তো দেশে বেকার সমস্যা, তার ওপর তোমাদের প্রতিযোগিতার সকল জায়গায় পরাজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী!

- কেন তোমাদের যদি গুণ থাকে?
- গুণ আমাদের অনেক, কিন্তু তোমরা যে মেয়ে। মেয়ে যদি খুনিও হয়, তাহলেও বিচারালয়ে তার বিশেষ সম্মান। মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মানুষের সহজাত। একটা মেয়ের জন্য একটা জাতি তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু

একটা পুরুষের জন্য নয়। তুমি জানো সামান্য নারীর দেহ আজো এই বিংশ শতাব্দীর সত্যজগতকে শাসন করছে?

– তুমি বোধ হয় সে শাসনের বাইরে?–সুখলতা কহিল।

– না, আমিও তা মাথা পেতে নিয়েছি। তুমি স্ত্রীলোক বলেই রাত জেগে জেগে প্রলাপ বকচি। পুরুষ হলে ঘুমিয়ে এতক্ষণে ভোর হয়ে যেতো। তুমি স্ত্রীলোক বলে, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। (কুমার, ৫৮)

মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত ঠিক তোষামোদের ভাষা নয়। তবে মানবের যে মনোবৃত্তি থেকে তোষামোদের জন্ম হয় নায়কের কথাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তা জড়িত থেকে নায়িকার চিন্তাকে তা প্রসন্ন করে তুলেছে। নায়িকার চেহারার মধ্যেও তার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে তিনি তোষামোদের ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রবোধকুমার স্যানালের 'প্রিয় বান্ধবী', 'রবীন্দ্রনাথের আবেদন', 'সাধনা', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি রচনা উল্লেখ করেছেন।

৭.৬: *রাজনীতির ভাষা*: সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সামাজিক প্রপঞ্চের সংশ্লিষ্ট হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন উপাদানের সারথি হয়ে তার জীবন চলায় দেখা দেয় বহুমাত্রিক প্রত্যয়। জীবনঘনিষ্ঠ এসব বস্তু কখনও ইচ্ছায়, কখনও অনিচ্ছায় আবার কখনও বাধ্য হয়ে জীবনে ঠাঁই দিতে হয়। এ কারণে মানুষ হয়ে ওঠে বহুমুখী বিবিধ প্রত্যয়-সংযোজী কর্মের অংশীদারী। আর এসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় ভাষার মাধ্যমে। মানুষ যত নির্বাহনী ক্ষমতার অধিকারী হয় ততই তার ভাষা হয়ে ওঠে বহুপ্রপঞ্চী। ভাষার মাধ্যমেই প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ এসব কাজের সারথি হয়ে ওঠে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ভাষা যেহেতু মূল সংজ্ঞাপন হাতিয়ার, তাই ভাষার ব্যবহারও তার কাছে বহুমাত্রিকতায় রূপ নেয়।

রাজনীতির সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্বয় নির্ণয় যেমন সংশ্লিষ্ট তেমনি দেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বও কম নয়। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য নয় বা রাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে বা অন্য কোনো সমস্যার আগম ঘটতে পারে এমন কিছু কাজের জন্য নয়। সমাজের মূল্যবোধ ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটানো এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে সবাইকে একত্র করার প্রয়োজনে মত প্রকাশের এই স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে (হোসেন, ২০০০)

রাজনীতি মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বলে তা মানবজীবনের অনন্য অধ্যায় হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে। রাজনীতি কেবল সামাজিক মানুষের স্বরূপে উদ্ভাসিত হওয়ার উপায় নয়, তা মানুষকে মানুষ হওয়ার মানদণ্ড হিসেবেও স্বীকৃত। তাই রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের ভাষার ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে সমাজবাস্তবতায়। মানুষ যেমন সামাজিক

জীব, তেমনি সে রাজনৈতিক জীবও। রাজনীতির ভাষা ও প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাজনীতির ভাষার সংবাহনগত দিক স্বতন্ত্র বলে ভাষা ব্যবহারেও তার স্বাতন্ত্রের দিকটি লক্ষ করা যায়। রাজনীতির ভাষা আবার দেশভেদে ও সংস্কৃতিভেদেও পার্থক্য হয়ে থাকে। কারণ, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। নিচের উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য-

শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ ভাষার উপযোগী শব্দ সৃষ্টি করে নেয়। এসব শব্দ যে একদিনে সৃষ্টি হয়, তা নয়। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যাদের হাতে থাকে, প্রয়োজনের তাগিদে কিছু শব্দ তাঁরা সৃষ্টি করে নেন। প্রতিদিনের ব্যবহারে তার কিছু টিকে যায়, কিছু টেকে না। আযাদীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ ধরনের প্রয়াস এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। আবার যুদ্ধবিগ্রহ কি রাজনৈতিক জয় পরাজয়ের ফলে শাসনব্যবস্থার রতবদল হলে, কি নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এ ধরনের বহুবিদেশী শব্দের আমদানী হতে দেখা যায়। (পৃ. ৩১৩)।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে রাজনীতির ভাষায় এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর তুর্কি শাসনামলে এদেশে শাসনকাজের ভাষা ছিল ফারসি। এ কারণে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষায় অনিবার্যরূপেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এ শাসনব্যবস্থার পর শুরু হলো ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসন। বাংলা ভাষায় ফারসির একক আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয়ে সে স্থলে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির।

ইংরেজরা এদেশে শাসন করেছে প্রায় দুশো বছর। এ দুশো বছরে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে তার ভাষাব্যবহারের দিকটিও উপেক্ষিত থাকেনি। শাসকগণ শাসনব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দেয়ার জন্য যেসব কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন, তাতে ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি আরও প্রকটিত করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত ভাগের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর এদেশে যে পাকিস্তানীরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য যে অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল তার কথা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সর্বপ্রথমে পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করার জন্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত হন। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সর্বপ্রথম সংঘাতের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে। বিবেকহীন উক্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব বিষয়টিকে আরও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। পরবর্তীকালে '১৯৫২ সনের ৩০ শে জানুয়ারিতে তিনি ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে এক সভায় 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' (রহিম ও অন্যান্য, ২০০৬: ৪৫৫)। এ ভাষণটি ভাষার প্রশ্নটিকে আরও জোরালো করে তোলে। রাজনীতিকে স্থায়ী করার মানসে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ভাষাব্যবহারের অপকৌশল বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার ভাষায় এর বিরূপ প্রভাব পড়তো অনিবার্যভাবে। এরূপ প্রভাব যে কোনোক্রমেই বাংলাদেশের মানুষদের জন্য কোনো সুসংবাদ বয়ে আনত না তা এদেশের সর্বসাধারণ বুঝতে সক্ষম

হয়েছিলেন। তাই তাঁরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে রাজনীতি যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি এখানে ভাষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনীতিকরা নিজেদের প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। মুহম্মদ আবদুল হাই রাজনীতির ভাষা প্রবন্ধে আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কাজ হাসিল করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যক্তিবর্গের হাতে ভাষা কেমন রূপ নেয় সেসব বিষয়ও তিনি তুলে ধরেছেন। কোনো বিষয়ের প্রতি দেশ বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ও সে বিষয়কে প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষার আশ্রয় নেয়া হয় এবং ভাষা ব্যবহারে দেখা দেয় ভিন্নতা। ভাষার প্রয়োগ দেশের জন্য কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটোরই প্রতিফলন দেখা যায়।

৭.৭ *সুভাষণ*: অশোভন, কদর্থক বা অমার্জিত শব্দের পরিবর্তে সদর্থক শব্দ ব্যবহারকে বলা হয় সুভাষণ। ভাষার অনেক শব্দ শোভন পরিবেশে ব্যবহার করা যায় না ব্যবহার করতে দ্বিধার জন্ম নেয়। আবার অনেক শব্দ অকল্যাণ অর্থ জ্ঞাপন করে। এসব ক্ষেত্রে সুভাষণের আশ্রয় নেয়া হয় (আজাদ, ২০০৪)। যেমন, কেউ মারা গেলে তা সরাসরি না বলে বলা হয়ে থাকে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে পরবাসী হয়েছে, সে আমাদের মাঝে আর নেই, সে জান্নাতবাসী হয়েছে, সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, সে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হয়েছে, সে জান্নাতবাসী হয়েছে প্রভৃতি। ঘরে চাল নেই, না বলে ঘরে চাল বাড়ন্ত বলার মতো রীতি বাংলা ভাষায় প্রচুর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'সুভাষণ রীতি' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সুভাষণ রীতি তুলে ধরেছেন। 'তিনি নানা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন ভদ্র সমাজে নগ্নরূপের কেমন ভদ্র নামকরণ করা হয়েছে। এই সুভাষন বিশ্লেষণ করলে জাতীয় চরিত্রেরও সুন্দর বিশ্লেষণ করা যায় (খান, ২০০০: ১১৫)।

৭.৮ *আমাদের বাংলা উচ্চারণ*: মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচনার বিষয় হলো মৌখিক ভাষা। উচ্চারণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ উচ্চারণের ওপরেই নির্ভর করে সংজ্ঞাপনের প্রকৃতি। উচ্চারণের মাধ্যমে আবার ব্যক্তির সংস্কৃতি ও মননও প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে অঞ্চলভেদে উচ্চারণের ভেদ অনেক। এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভাষার পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে speech training এর ব্যবস্থা নেই বলে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ সবার দ্বারা হয় না। বাংলা ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের আদর্শ উচ্চারণ বা received pronounciation দূরে থাকুক স্বীকৃত উচ্চারণও হয় না। মুহম্মদ আবদুল হাই আদর্শ ও স্বীকৃত উচ্চারণ তৈরির জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

৭.৯ ভাষা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা: ভাষা-সম্প্রদায়: ভাষা-সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্লুমফিল্ড বলেছেন,

'' একটি ভাষা সম্প্রদায় হচ্ছে একদল লোক যারা উক্তির মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া করে'' (ব্লুমফ্লিড, ১৯৩৩: ৪২)।

ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে হলে ভাষা-সম্প্রদায় বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে, তা জানা প্রয়োজন। তদুপরি জানা প্রয়োজন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কি, বিশেষ বিশেষ ভাষা সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সদস্যদের মনোভঙ্গি কি রকম। আরো জানা প্রয়োজন, ভাষা-সম্প্রদায়ের সদস্যরা কোন প্রক্রিয়ায় ভাষা সংরক্ষণ করে, কোন প্রক্রিয়ায় ভাষা পরিবর্তন করে, কোন প্রক্রিয়ায় ভাষা পরিচর্যা করে ইত্যাদি। (মুসা, ১৯৮৫:১৮)। মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্দেশ করার জন্য ভাষা সম্প্রদায় অভিধাটি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

৮. উপসংহার

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনাতে মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় সহজেই। তিনি বাংলা ভাষা ও উপভাষার বৈচিত্র্যময় ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে তা করতে পারেননি। তিনি আশা করেছিলেন যে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার আলোচনা আরও ব্যাপক হবে। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে যৎসামান্য কাজ হলেও তা আজও পূর্ণতা পায়নি। ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনায় তাঁর অবদান কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় মুহম্মদ আবদুল হাই এক অনন্য প্রতিভু এ কথা সব সময় প্রাসঙ্গিক।

তথ্য-নির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন। (২০০৪)। *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আহমদ, ওয়াকিল। (২০১১)। মুহম্মদ আবদুল হাই। (সম্পা.) ওয়াকিল আহমদ। *বাংলাপিডিয়া*, ২৮৯-২৯০, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি

ইব্রাহিম, নীলিমা। (১৯৯০)। *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

ইসলাম, মোস্তফা নূরউল। (২০০০)। আমাদের মাতৃভাষা- চেতনা ও ভাষা আন্দোলন। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ

খান, আজহারউদ্দীন। (২০০০)। ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই। (সম্পা.) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারক গ্রন্থ*, ১০৫-১২৫। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ। (২০০০)। মুহম্মদ আবদুল হাই: জীবন ও সাধনা। *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারক গ্রন্থ*, ১৩-২০। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

বিশ্বাস, শ্রীসুকুমার। (১৯৬৮)। *ভাষা-বিজ্ঞান পরিচয়*। কলিকাতা: জিজ্ঞাসা

মুসা, মনসুর। (১৯৮৫)। *ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৬৫)। *বাংলাভাষা-পরিচয়*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (১৯৯৫)। *মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

রহিম, মুহম্মদ আবদুর ও অন্যান্য। (২০০৬)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: কিতাবিস্তান

মুসা, মনসুর। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

মুসা, মনসুর। (১৯৮৫)। *ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

হক, মুহম্মদ এনামুল। (২০০০)। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। (সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারক গ্রন্থ*, ৭৬-৮২, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৫৪)। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: দি এফ.এইচ পাবলিশিং হাউস

----------(১৯৯৪)। The impact of Society on Language. (সম্পা.) হুমায়ুন আজাদ, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* ৩, ৬১০-৬১৬, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

শ, রামেশ্বর। (২০১২)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি

সরকার, পবিত্র। (১৯৯৪)। শতাব্দীর বাঙলাভাষা চর্চা। (সম্পা.) মনসুর মুসা। *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা*, ২৫-২৯, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

হোসেন, কাজী মোতাহার। (২০০০)। তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা। (সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারক গ্রন্থ*, ১৩৮-১৪০, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

হোসেন, ফারুক। (২০১৮)। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধ্রুব নক্ষত্র*। টাঙ্গাইল: ছায়ানীড়

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৯৪)। ভাষার কথা। (সম্পা.) হুমায়ুন আজাদ। মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৮০-২৮৩, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৯৪)। তোষামোদের ভাষা। (সম্পা.) হুমায়ুন আজাদ। মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৮০-২৮৩, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

Hockett, Charles. F. (1968). *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Macmillan Company

Paul Simpson, Paul. (1997). *Language through literature*. Rutledge: London and New York